রাজধানী ও মধুবংশীর গলি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা-৬

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ-চিত্র
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ঊর্মিলা-কে

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কবিতাকে কোনো কোনো সমালোচক 'পার্সোনাল' ও 'সিভিক' এই দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। কবিতার ব্যাপারে এভাবে পাঁচিল তুলে ভাগাভাগি কিছুটা অস্বস্তিকর হলেও বোঝবার সুবিধার জন্যে চরিত্রগত এই তফাতটা মেনে নেওয়াই ভালো। কবি কোনো সময়েই সমাজ নিরপেক্ষ প্রাণী নন। কাজেই একেবারে নিজের কথাও একদিক দিয়ে সমাজেরও কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্রা বেশি চড়ালে যে এক সময়ে বেশ একটু গুণগত পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে তা স্বীকার করতেই হবে। কবির নিজস্ব আবেগ-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-যন্ত্রণার প্রকাশও সেই রকম কখনো কখনো একক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বলে মনে হতে পারে। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যকেও খানিকটা সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, না হলে সে কবিতা হিং টিং ছট হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, এমন কবিতাও আছে যা কবি নিজের মনের আবেগ-আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তু ও মনোযোগ বিশেষভাবেই সমাজ সংশ্লিষ্ট। সামাজিক সমস্যা, সমাজপ্রগতি, মানুষের ভালোমন্দ, এইসবই এ ধরনের 'সিভিক' কবিতার প্রেরণার উৎস। এবং কেবল তাই নয়, এসব কবিতার লক্ষস্থলও সমাজ।

অর্থাৎ 'পার্সোনাল' কবিতাকে যদি বলা যায়, প্রধানত নিজের সঙ্গে সংলাপ, তাহলে 'সিভিক' কবিতাকে বলতে হবে, প্রধানত সমাজের সঙ্গে সংলাপ

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতা মোটামুটি দ্বিতীয় জাতের বলে সনাক্ত করা যায়। যদিও 'পার্সোনাল' কবিতাও তিনি যথেষ্টই লিখেছিলেন।

একালের পাঠক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতা খুব একটা পড়ার সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কেননা ইদানীং লিখছেন তিনি কম। কিন্তু তাঁর 'মধুবংশীর গলি'-র নাম শোনেননি এমন পাঠকের কথা কল্পনা করা যায় না। 'মধুবংশীর গলি', সকলেই জানেন, সমাজ-মনস্ক কবিতা ; এবং আকারে সুদীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এককালে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কলকাতা এবং অখণ্ড বাংলার অজস্র শহরে, এবং বাংলার বাইরেও নানা জায়গায়

এ কবিতার আবৃত্তি শোনা গেছে। সেটা ছিল বিদেশী শাসনের নৃশংসতম অধ্যায়, যখন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতায় চলছে নিষ্প্রদীপ আর নারীমাংসলোভী বিদেশী সৈন্যের আনাগোনা, এবং তারই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারার সেই ষড়যন্ত্রমূলক দুর্ভিক্ষ। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনেরও তখন তুঙ্গ অবস্থা, আর তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে তখন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন, প্রগতিসাহিত্য আর নবনাট্য আন্দোলন। এরই বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত এবং বেদনার্ত প্রতিফলন ধরা পড়েছে 'মধুবংশীর গলি' নামক কবিতার দর্পণে। আর সে বেদনার আঘাতে আমাদের চেতনার দিগন্ত যে বেশ খানিকটা প্রসারিত হ'য়েছিল তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু 'মধুবংশীর গলি' ছাড়াও আরো অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তার বেশ কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান সংগ্রহে। কিন্তু তাঁর শক্তি 'মধুবংশীর গলি'র সেই তুঙ্গ বিন্দুকে আর মাত্র একবারই স্পর্শ করেছিল 'রাজধানী' নামক কবিতায়। বলাবাহুল্য দুটি কবিতার চরিত্র একেবারে আলাদা, কিন্তু একটা ব্যাপক পটভূমির ওপর কাজ করার ক্ষমতা দুটি ক্ষেত্রেই একই রকম। এবং তার সঙ্গে রয়েছে ইতিহাস বোধ, যা দ্বিতীয় কবিতাটিতে দিয়েছে একধরনের ট্র্যাজিক মহিমা।

দুঃখ এই যে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রধানত কবি হলেও, নিছক কবিই শুধু নন। তিনি সঙ্গীত রচয়িতা এবং সুরকারও। এককালে 'মধুবংশীর গলি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত 'নবজীবনের গান'ও শত শত অনুষ্ঠানে শোনা গেছে। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে এই উভচারিতা সুখাবহ হয় নি। তাঁর ব্যক্তিসত্তা যেন দু ভাগে আলাদা হ'য়ে যেতে থাকল, এবং ক্রমে গানই তাঁকে নিজের রাজ্যে টেনে নিয়ে গেল।

সে কথা থাক। ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে যা আমরা পেয়েছি তা কম নয়। বাংলায় আধুনিক কবিতা আন্দোলন শুরু হবার পাঁচ সাত বছরের মধ্যেই কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি। এবং অচিরেই তিনি শ্রীবিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের যোগ্য সহযোগী হ'য়ে ওঠেন। 'পরিচয়' এবং 'কবিতা' পত্রিকাতে নিয়মিত কবিতা বেরোত তাঁর, এবং উভয় পত্রিকার সান্ধ্য বৈঠকেই তাঁর সরস সুন্দর উপস্থিতি সকলকে আনন্দিত করে তুলত। পরবর্তী কালে তিনি ছিলেন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও গণনাট্য সঙ্ঘের

অন্যতম সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এবং এই প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতাই ছাপ ফেলে গেছে তাঁর কবিতার ভেতরেও। কবিতাগুলি পড়লেই যেমন তার সাঙ্গীতিক মাধুর্য কানকে তৃপ্ত করে, তেমনি একটি দরাজ হৃদয়ের উন্মুক্ত মানবিক সম্বোধনও মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

এই অসূয়াহীন মানবিক প্রীতিময় কবিতার জন্যেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র চিরদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন।

মণীন্দ্র রায়

সূচী

স্বস্তি-বাচন

[Dialectics of thought Process]

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, হে পর্বত-মাতা,
মোদের উদ্ধত চূড়া স্ফটিক মিনার !
যে কামনা জমে জমে নীল হয় আকাশের মত
আমাদের উপরতি আর উপবাসে বিক্ষত
প্রকৃতির রোষে এই একাদশী-জীবন কিনার,
ফেনপুঞ্জে ভারাক্রান্ত। হে অম্বুজ মাতা !
এই সব মানুষের ক্ষুরধার স্বপ্নের চূড়া
ছিন্ন ভিন্ন করে যদি অঞ্চল তোমার,
ক্ষমা করো সম্বরণ করো অভিশাপ।
আমাদের আরো কত পাপ
স্ফীত নীল শিরায় শিরায়
বিষধর অজগর ; সুপ্ত কুণ্ডলিনী।
অষ্টসিদ্ধি তাই পরাহত ॥

আর এক দৃশ্য দেখি ! নগর আহত
উপার্জনে, অপার্জনে, অর্থনাশে মনস্তাপই শুধু।
সুদৃশ্য মোটর-যাত্রা উদয়াস্ত ব্যস্ত করে স্নায়ু।
শ্যামল পল্লীর বাটে, হা, হা, করে মড়কের বায়ু—
ম্যালেরিয়া দূত ফেরে ঠিকানার খোঁজে ;
প্লীহাস্ফীত পদাতিক নিদ্রালস গুরুতর ভোজে ॥

গিরিডির ট্রিপ শেষ হল।
এবারে ত কালিম্পং ?
দূর্ দূর, ডাহা জোচ্চোর।

হোটেলওয়ালারা সব পাজি।
দৈনিক দ্বাদশ মুদ্রা গুণে নেবে ঠিক,
তবু যদি শালাদের লোভ কিছু কমে,
বিয়ারেতে একস্ট্রা ফি নেবে এক টাকা।

রেশমী পতাকা
শিথিল বাসনা মন হৃদয়ে উড়ায়,
শীর্ণ পীত পাতা যেন বৈশাখী ঝঞ্ঝায়।
বিষাক্ত বায়ুর গায়ে হাত ঘষে তীক্ষ্ণ হল মুঠি।
এইবার আত্মরক্ষা আততায়ী থেকে।
কামনার মূর্তিগুলি প্রেতের মতন
পিণ্ডকামী ; রাত্রের গাঢ় গুহা হতে
ড্রইং রুমের কোণে একে একে জমে।
ভুরি-ভোজীদের পাড়া স্বপ্নে যায় ভরে
স্বর্ণ-বৃক্ষ নিচে দেখি প্রখর পাহারা,
খড়্গধারী পুরোহিত রক্তচক্ষু ফেরে।
ডালে ডালে চিন্তামগ্ন অতিকায় পাখী ;
অপ্রাকৃত রহস্যের মলিন আলোকে কাঁপে ডানা॥

মর্মর-মূক মার্কিনী ঢং মুখে ;
ছায়ায় কায়ায় তেজারতি কারবার।
স্মৃতি কৃত্রিম মূর্তিতে ঠাসাঠাসি ;
প্রবল কামনা আসে যায় বারবার।
প্রজ্ঞা-ঠকানো শুক্লা রাতের নিচে,
অগভীর মুখ ছায়াদের কাছাকাছি।

পুতুল-নাচের প্রেম নিবেদন মিছে ;
নিস্ফল শুধু কঙ্কাল বাছাবাছি ॥

যেন মনে হয় দূরে কোনো লাল বাড়ী
হতে ভেসে আসে নীল আলোকের স্রোত
কচি শিশুদের কান্নারা নামে নিচে
বিশ্বম্ভর ঘুমে ভরা বস্তির ।
সহসা কি করে আগুন লেগেছে দেখি !
লাল বাড়ী লাল আগুনের পদানত ।
তন্দ্রা পালায় মদালস স্বস্তির ।
সুডোল বাবুরা নিচে করে ছুটাছুটি ।
অপরূপ ছায়া ব্যঙ্গ-চিত্র যেন ।

পিতৃলোক

ক্লান্তি নেমেছে নগরের বুকে—
ধূসর মেঘের অঞ্চল ভরা পাপ।
ধন-ভাণ্ডারে অনশনে মরে
বিরহী যক্ষ—গলিত মাধবী মঞ্জরী আর
নির্জন প্রান্তর।
চর্ব, চোষ্য, পানীয় চার্বাকেরও
ধূলি ধূসরিত।
ইতিহাস শুধু হাসে বিধাতার হাসি।
তাই ক্লান্তির ছায়া,
ব্যসনের গ্রাসে—ফণিমনসার
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘোরে কাক।
আয়ু সীমানায় মহাত্মাদের সারি।
কুম্ভীপাকের ভাবনা কাঁপায় পা—
পুণ্যের থলি গোণাগুণি, চাপা
ফিসফিস কানে কানে।
নিদারুণ শীতে হাড়ে হাড়ে ঝঙ্কৃত,
তিব্বতী কৈলাস।
দূর হতে শুনি,
লৌহ কবাটে শৃঙ্খল-গুঞ্জন।
এবার শাস্তি-পুরস্কারের তুহিন রাত্রিদিন
আর্তনাদের দুর্বার প্রান্তরে
দুয়ার কি যাবে খুলে!
তবু ভাল,
আমি শোভাযাত্রার শেষে।

কুষ্ঠের সারি,
অন্ধ, খঞ্জ, বধিরেরা গলাগলি।
মৃতবৎসার বৎসেরা জমে, মেঘের মতন
হামাগুড়ি দিয়ে, দূরে।
অস্ত্রোপচারে, হাসপাতালের দল—
অন্ত্রবিহীন, যন্ত্রণা-কুঞ্চিত
কবন্ধদের সারি।
স্বদেশ প্রেমিক,
টেররিস্টদের ঘাড়ে চেপে চলে—
এখানেও বক্তৃতা!
কামুক কামুকী মৈথুনরত,
কুক্কুর-কুক্কুরী।
বিশ্বপ্রেমিক মাতালেরা করে,
ছায়াদের হাতে আত্মসমর্পণ।

আমাদের ক্লান্ত দেহে
সাড়া নাই প্রারব্ধ পাপের।
প্রাক্তন, পাতক স্রোতে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে গেছে আজ।
প্রার্থনার শেষ ঋণ,
শোধ করি তর্পণের তিলে,
পিতৃলোক পানে।
উর্ধ্বে জ্বলে ধরিত্রীর কামনা তপন—
যে-কামনা স্থবিরের—
শিথিল পেশী ও মেদে। ঘোরে কৃমিকীট

অস্ত্রে অস্ত্রে।
অগ্নিমান্দ্য তাই কল্প শেষে।
আজ তাই পুংসবন
অনুর্বর, বর্বরের হাতে।
পৃথিবীর রক্তমাংস চক্রহীন-প্রজ্ঞাহীন
পাতালের পথে।
প্রপঞ্চের যাত্রাশেষে ক্লান্ত তাই স্থবিরের গান

বহুব্রীহি

চূর্ণ পঙ্ক,
ছিন্ন ভিন্ন স্বর্ণ বিহঙ্গম ;
রৌদ্র দীপ্ত দিনগুলি মোর।
কুৎসিৎ ও কণ্টকিত সরীসৃপ যেন,
রাত্রির কঠিন স্তব্ধ প্রাচীরের গায়ে
ভয়গুলি ফেরে।
কালকে দুর্মুখ চিঠি পেয়েছি তোমার ;
শেষ ছত্র :
লুব্ধ-চক্ষু-লেহ্য এই নারী দেহ হল অস্তমিত

ক্লিওপেট্রা শালীনতা
মদদৃপ্ত চোখে মুখে দেহে,
আঙুলের আরক্তিম নখরচূড়ায়,
জটিল খোঁপায়।
শীর্ণস্নায়ু আলোকের শিখা
অগ্নিপ্রভ ওষ্ঠপুট যামিনীজাগর,
নিভে যায় ঝড়ের ফুৎকারে॥

এটা জানো ঠিক,
আমিও ত জানি,
যদিও গভীর রাত্রে ট্যাক্সি থেকে নামি
স্খলিত চরণে,
মাত্রাশূন্য উচ্চারণ টলে টলে ফেরে
মন হতে মুখে—

সভ্যভাবে জেলে দেবে আলো,
নিষ্প্রশ্ন নির্বাক চোখে শুধাবে আমায়—
কুমারটুলির কোনো নিষ্ঠুর প্রতিমা যেন
সার্বজনীন পূজাগৃহে—
খাবে কি ?   খাবার আছে ঢাকা ঐ কোণে—
দরকার থাকে যদি ডেকো, আমি চলি।
অর্গলের বজ্রাঘাত কক্ষান্তরে শুনি।
এইরূপই চলে ;
জীর্ণ সমাজের বুকে রাত্রি আর দিন।

কঞ্চুকীর দিন গত প্রায়
মস্থণ এ স্বৈরাচারে
নূপুর-শিঞ্জন-স্তব্ধ অন্তঃপুর ব্রীড়ালাস্যহীন।
সুরভি নিঃশ্বাস আজ দিগন্তে বিলীন।
সহস্র দিনের চেনা এ শহর অন্তঃসারহীন
গজভুক্ত কপিত্থের মত।

একশো পঁয়ত্রিশ নং বনছায়াবীথি—
অবলোকিতেশ্বর
থাকে।   বসু, মৈত্র, সেন নয়,
শুধু অবলোকিতেশ্বর
অবিনশ্বর।   এক নয়, আছে তারা।
রাজকীয়, নাটকীয়, পরকীয় পোষাকের ভারে
ভারবাহী তোলে উচ্চরব।
বাৎস্যায়নও পড়ে রাত জেগে

সানাই-বিক্ষিপ্ত মনে।
সবুজ-হৃদয়-দীঘি হল যে উতল,
মেঘপক্ষ তারিখের ঘন যাতায়াতে,
ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, মাঘ, বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণের—
—নাঃ মাইরি,
এ হেন দামড়াবাজি আর কতদিন—
মার্ক্স পড়ে এবং বোঝে না।
এঙ্গেলস—অ্যান্টিড্যুরিং—
মাথার দিব্যি আছে, পড়তেই হবে।
আর, একটু সাহিত্যিক জীবনযাপন
দায়িত্ব-স্বামীত্বহীন রিরংসার বেগে।
অ্যাল্‌ডিংটন বলে—রিচার্ড না পল ?—
মূল-মূল্যহীন হয়ে থাকাই ত সার ;
মিস গ্রিফথ্‌সও বলে তাই,
মাতিসের চেয়ে অগষ্টস্‌ জন-ই কাম্য।
বেশ লোক তারা—
মুঠি মুঠি খুশী নিয়ে খেলা করে, রুমালেতে মাখে
মনে, মুখে, চোখে। আর সিবেলিউস্‌—
ব্লক্‌ সিমফনি আর ডন কুইকসোট
বাখ না ফৈয়াজ খাঁ ?—
দোহাই যামিনী রায়
আপনিই অন্তরায়
এ জটিল পথে।
আপনার ও সুগভীর দৃঢ়বদ্ধ মূলে
যা করেন, তা-ই সাজে।

আপনার বলিষ্ঠ তুলি যেন বজ্র হানে
মসৃণ ও কৃশকায় অগভীর মনে।
তবু,—তবু অবিনশ্বর
অবলোকিতেশ্বর
দারুচিনিবনছায়া বীথি ॥

রৌদ্রের ফলকে দীর্ণ মেঘবর্ণ ত্বক,
হে আকাশ, প্রখর আকাশ।
স্বর্ণকুম্ভে নবতম কামনা উচ্ছল।
তোমারে পেয়েছি আর
আমারে পেয়েছি আরবার
আকাশের নীলতম চিত্তের মাঝে
স্বর্ণপ্রভ চিল,
শ্রেণীহীন, বেণীহীন জীবনে আমার।
অর্থ-দুঃশাসিত পৃথ্বী
তবু, ফেলে যাবো আমি কোথা!
কর্কশ নিঃশ্বাস ছাড়ি ঘর্মাপ্লুত ট্রামে বাসে ফেরা,
অনিচ্ছায় বহু চোখে চোখ মেলে রাখা—
জ্যামিতিক, সাহিত্যিক ভীড়ে।
নামের এ রাজসূয় যজ্ঞক্ষেত্রে ঘুরি,
একলাই ঘুরি,
নির্লোম ও ঘৃতপক্ক।
অজর প্রাণের বিম্ব কায়াবান মুকুরেই দেখি
কাতারে কাতারে পড়ে পথের দুধারে।

বিংশোত্তরী

সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি দ্রুত চলে।   সুরের প্রপাত
অলিতে গলিতে ঢোকে—রৌদ্রালু প্রহর,
কাক, চিল, চড়ুই-এর স্বর।
অর্থবান ও অর্থবতী নিদ্রার পুঁজিরে করে খালি।
রৌদ্রপুত বর্ণপ্রভ বাড়ী
লাল, নীল, পীতাভ প্রাকারে
উঁকি মারে একমুঠো দিবাস্বপ্ন পানে ;
ছিন্নকন্থা পরিহিত পথিকে সুধায় :
সুপ্রভাত—কফি কিছু, কোকো কিংবা চা ?
হায়রে দুর্ভাগা দেশ !
সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি ও-ছবির ফ্রেমে
রূপালি সুরের আঁকাবাঁকা রেখা টানে।

ছিন্নকন্থা পরিহিত সে পথিক থামে
থামের আড়ালে।
থামের আড়ালে দেখি বর্ণ চোরা চোর,
তস্করের জটিল জীবন
পথের কিনারে।
ইষ্টাপূর্ত্ত সাধনায় কখনও কুক্কুর বেশী
কখনও লস্কর।
নিবিষ্ট বুকের চিত্তে মীনগন্ধী ঝড়,
জিঘাংসার নিশ্চল সমাধি।

থামের আড়াল কিছু নিরাপদ নয়।
শৃঙ্গী হতে শত হস্ত দূরে।
পাখীগুলি পেলো ছাড়া প্রাণের আকাশে ;
নিরাশ্রয় পক্ষাবেগ রচে ঘন নীড়,
পথাশ্রয়ী বৃক্ষদের পত্রপুঞ্জ মুছে নেয় তাদের বিস্তার
কামনার মাঝে—
প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীর। লঘু চক্ষু ঘোরে ফেরে
প্রতিদিন আবৃত্তির মত—
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি নিষ্কাম সঙ্গমে,
রেলিংএর ধারে কিংবা ধর্মতলার
মোড়ে। পাবে শান্তি কোন্ সমন্বয় মাঝে
লাঞ্ছিত পথিক।
সারেঙ্গীর দ্রুত গতে বাঁধা এই পদসঞ্চালন,
ধমনীর গতি।
প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখি অট্টহাসে সমের চূড়ায়
শ্বেত ও ফেনিল ;
রক্তে শুনি তুরঙ্গম হ্রেষা হুর্নিবার।
পাদপের জনারণ্যে বর্ষজীবী বল্কলের জনারণ্যে আর
ছায়ায় ছায়ায় ঠাসা শাখাদের গলি।
এর মাঝে শান্তি খোঁজা
চকিতে বিদ্যুৎপ্রভ কুঠারের ক্রোধে শুধু প্রমাদ গণনা॥

আজও হে অর্যমা,
আনন্দের প্রস্রবণে শুনি তব হিরণ্য কল্লোল
প্রাচীন ও অর্বাচীন কালে।

প্রাণবান রৌদ্রের উষ্ণ অনুরোধ
পানাহার মত্ত রক্তকণাদের ডাকে,
বাণিজ্যের যৌথ পোতে, দূরে।
স্ফটিক সৌধের চূড়া লাখে লাখে সূক্ষ্ম মাথা নাড়ে
নিশ্চিন্ত মত্ততা আনে সামুদ্রিক সুরা।
কাকাতুয়ার আর্তনাদ ও উন্মত্ত নর্তন, এই দিনগুলি যেন।
জনসমুদ্রের ক্রুদ্ধ ঢেউ ভাঙে নিচে,
ভিত্তিমূলে লাগে শিহরণ।
স্বেদ-গর্ভ শ্রমে,
স্বপ্নমোড়া রাত্রিগুলি অভিমানে আত্মঘাতী হল
একে একে। সঙ্গহীন প্রমায়ুর শেষে
নরযাত্রা দেখা যায় ধূলিবিলুণ্ঠিত ;
আন্দোলন প্রমিতি ও সমিতির ভীড়ে
মুখের রেখায় কাঁপে লেনিন-সুষমা, কড়া চুরুটের ধোঁয়া।
সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি কষা হানে দীপকী গমকে।

তারপর শান্তি আসে বর্ষাধৌত পল্লীসম নামি,
প্রখর শ্যামল, কত সমতল ও পিচ্ছিল মনে।
রজস্বলা ধরিত্রীরে বহু প্রজা করেছে অর্যমা
বীর্যবান করে। প্রাণ, আবর্তের প্রচণ্ড ঘূর্ণনে
চারু ভ্রূণ-ত্রিভঙ্গের কায়াকৃত তাপে ছায়াকামী।
অভ্রংলিহ দুরাশার মনোলৌল্যে নেই বুঝি ক্ষমা
সৌর আদালতে তাই উৎকোচের লুপ্ত ইন্দ্রজাল।
স্বচ্ছ মনে লিবিডোর বোধহীন সুস্থ ঋজুপথে,
প্রাণোর্মির হর্ষনাদ মৃত্যুহীন সৌর শিশুদেরই।

যুগান্তের অপঘাতে, ভৈরবের তাণ্ডব করাল
স্ফূর্তিই দেখি। এই বসুধার আয়তি-সরণী
রক্ত সূর্যে সমুজ্জ্বল, অবিনাশা পূর্ণ মনোরথে।
কাম-মুকুলিত মনে বর্ণছত্রে ঘেরা ঘটাকাশে,
নব নব যাত্রারম্ভে অজর এ পটাকাশ হাসে ॥

একটি প্রেমের কবিতা

উদ্ধত আবেগ নিয়ে স্তম্ভিত পুলিশ্ এই মন।
অদ্ভুত এ মন।
চলোর্মিমুখর দ্রুত ট্র্যাফিকের পাকে
মসৃণ কঠিন স্তম্ভ প্রহরীর মত তাই থাকে।
অধিশাস্তার মত কোতোয়ালী চণ্ড,
লৌহ শিরস্ত্রাণ পরা সামরিক সণ্ড।
বিচিত্র এ মন।
বৈমাত্রেয় পৃথগাত্মা জনসমাগমে তাই জানাই প্রণতি
দুর্বোধ, দুরন্ত তার মতি।
আত্মরত অস্তিত্বের স্বার্থপর নির্মম খেলায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে অবান্তর কথারা ফেনায়
সহস্র-নাগিনী-ফণা তরঙ্গ চূড়ায়, ক্ষিপ্ত জনসমুদ্রের।
পাণ্ডুর সৈকতে শুধু খুঁজে ফেরা ভঙ্গুর কঙ্কাল,
ব্যর্থ অতীতের ত্যক্ত সবুজ শৈবাল,
মগ্ন নাবিকের ছেঁড়া টুপি,
করুণ-কাহিনী ঘেরা ভগ্ন জাহাজের ছেঁড়া পাল,
ভাঙা হাল,
শূন্যগর্ভ খাবারের টিন,
এই সব, আরো কত কি!
অন্ত্যজ আত্মার নেই খোঁজ,
দিগন্ত বিস্তৃত শুধু জড়, দানবীয় এই ভোজ।
লবণাক্ত হাওয়া নাড়ে নিরন্ন আয়ুর কঙ্কাল।
বিকৃত করাল।

বাতায়নে ট্রামে বাসে, পথে ও প্রান্তরে,
কাকতাড়ুয়ার মত অঙ্গভঙ্গী
অপরূপ জীবনের নিত্যসঙ্গী।
বিষম সুষমামাখা সঙ্গিনীর সঙ্গীহীন ভীড়।

উনিশ শো তেতাল্লিশ সালে,
যে মন দাঁড়িয়ে আছে, এ পথের ধারে,
স্তূপীকৃত ধ্বংসের কিনারে,
সে মন ত নিরঙ্কুশ স্তব্ধ কম্পহীন।
এখন, যখন
আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণ
কিছুতে সম্ভব নয় বাণিজ্যের নব্য ব্যাকরণে,
সময় সম্ভারে
ভরে দেয় গৃধ্নু তার থলি,
ক্ষয়ের চূড়ান্তে নাচে আয়ের এ ঋতু।
প্রপঞ্চের পরিধির শেষ প্রান্তে ভগ্নস্তূপ ভগবানও বাঁচে
বিদূষক মুক্তিদূত মূর্ছিত হাসির বেগে সান্ত্বনা ছড়ায়
সে জানে না গূঢ় তত্ত্ব জন-সমাজের।
অতি-পঠনের ফলে অনিদ্রায় ক্ষিপ্ত নয় স্নায়ু।
অপেক্ষা রাখে না কোন স্বার্থান্ধ দলের
সে জানে মানবতত্ত্ব তর্কের অতীত,
বিশুদ্ধ কঠোর সত্য।
বীতরাগভয়-ক্রোধ হওয়া শক্ত আসক্তির দস্তুর মেলায়,
(কদলীপত্রের মত
নিরীহ শ্যামল মন নিয়ে বিশেষত।)

এই দুর্বিপাকে;
শ্রমে মুক্ত, শ্রমে শুদ্ধ পেশীবান মানুষকে চাই,
অন্যায়ের রক্তে স্নাত, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
করুণ কঠিন মাটি, পবিত্র বস্তুর আজ পেয়েছি সন্ধান।
নির্ভীক প্রতিষ্ঠা চাই ইতিহাস-সম্মত কালের পাহাড়ে।
বায়বীয় নৈহারিক জীবনও ত ভস্মীভূত প্রায়,
যুগান্তের কালাগ্নি শিখায়।
নব জীবনের নব দম্পতিরে তাই আজ করি আহ্বান।
অবাধ কল্পনা আর আবেগ, অবশ্য
দীপ্ত হয়ে উঠুক আবার,
মনে মনে দৃপ্ত তলোয়ার
মেঘে রৌদ্রে ঋতুতে ঋতুতে
দিগন্ত-বিজয়ী,
নিবিড় চন্দ্রালু ঘন রাত্রের আড়ালে॥

সময় এলো কি আজ!
ভস্মীভূত হৃদয়ের মীনকেতু সহসা উধাও দেখি,
প্রণয় বিহ্বল,
যুগান্তের কুলপ্লাবী আবেগের ঝড়ে।
ঊর্ধ্বে যবে মরণের লক্ষ লক্ষ বীজ
পক্ষ ঝাড়ে মারণলীলায়,
শ্রেণী নির্বিশেষে নর করে হায় হায়,
নিবিড় সময় শুধু হাতে আছে কয়েক মিনিট,
হৃদয়, হৃদয়, মোর।
ইউলিসিস হৃদয় আমার!
আবেগ ঘনাবে নীল ঝড়ে-ঢাকা মেঘেদের মত,

হয়ত বা স্তরে স্তরে,
পলাতক নির্জন প্রহরে।
তুমি চলে এসো আজ হে হৃদয়-স্বসা,
চলোর্মির প্রান্ত-খসা।
নিষ্ঠুর আকাশ আজ দেবে না আশ্রয়।
তুমি চলে এসো আজ, উন্মুক্ত, নির্ভয়
আমার ক্ষণিক এই দ্বীপে।
সাত সমুদ্রের ঢেউ ভাঙে যদি, ভাঙুক উদ্দাম চারিদিকে।
তুমি এসো চলে, মর্মাহতা!
রক্তে সরণী আছে পাতা—
প্রতীক্ষার স্তব্ধ সেতু বেয়ে।
শুধু এক মুহূর্তেরই ভুল যদি আসে এ জীবনে,
জয়ের মুকুট পরা,
যদি আসে, তুমি ক্ষমা করো।
কারণ সময় শুধু হাতে আছে কয়েক মিনিট।
তারপর হয়ত যাবে ভেঙে,
স্বপ্নালু অন্যায়,
উদ্ধত ও স্বার্থপর প্রেম;
ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হবে অভ্রংলিহ সোনার মিনার।
তবু ছিন্ন করে নিয়ে যাবো,
তোমার সান্নিধ্যটুকু
রক্তমাখা সান্ধ্য ফুল।
কঠিন কর্মের শুনি প্রবল গর্জন—
অমোঘ এ ডাক।
তবু জৈব রূপ পাক শুধু এক মুহূর্তের এ ভুল॥

নগর সংকীর্তন

মনান্তর চুলায় যাক,
মতান্তরের পতন হোক।
দুশমন দল হাতিয়ার হাতে হুঙ্কার দেয় দ্বারে
আমরা নিরেট বাধার দেয়াল
মাথা পিছু নেব এক এক শেয়াল।
নিশান উড়েছে ঐক্যের লাল
ঝড়ে॥

যদি মনে করে থাক
তোমাদের হাতে স্বর্গরাজ্য এনে দেবে কেউ,
মুক্তির মোয়া—
সে গুড়ে বালি,
সে মোহের হোক শেষ।
যদিও পিছনে অনেক লেগেছে ফেউ॥

কারখানায়
কারখানায়,
বিশ্বকর্মা হুঁশিয়ার আজ,
সঙীন শানায়,
ব্যোমযানভেদী বজ্র গড়ে
একাগ্র মনে।
আমাদের তরে মুক্তিমন্ত্র পড়ে॥

আমাদের আর ভুল করবার অবসর নেই।
আমাদের মুক্তি, জেনো,

বিশ্বের মুক্তি,
সব নির্যাতিতের মুক্তি
দানবদের হাত থেকে ॥
অনেক লোকই পিটছে টাকা
এই মাগ্যির বাজারে ;
দেশাত্মবোধের মুখোস ঢাকা
অনেক লোকই।
এরাও জেনো সেই ধূর্ত শেয়ালের দলে।
শয়তান এরা মূর্ত। ছলে বলে কলে
উদর পূর্তিই মুখ্য সাধন।
মুখ চিনে রাখ; ভয় নেই
হবে এদেরও পতন ॥

নগরে ও গ্রামে, প্রাণে ও মনে
পেশীতে স্নায়ুতে এক হয়ে উঠি প্রবল জোয়ান
শরিকের সাথে করি মিটমাট
সংকীর্তনে ভরি মাঠ ঘাট।
আমরাই জানি শত্রুর আজ ঘটাবই পরমাদ।
এক এক নগর, এক এক স্টালিন্‌গ্রাদ্‌ ॥

মতান্তর ভস্ম হোক।
রক্তচক্ষু দুশমন আজ হাতিয়ার হানে ঘরে।
গড়বো নিরেট বাধার দেয়াল,
মাথা পিছু কাটি এক এক শেয়াল।
নিশান উড়ছে ঐক্যের লাল
ঝড়ে ॥

তোমারই প্রেরণা পেয়েছি
বারে বারে আনন্দে গেয়েছি
নিরঙ্কুশ এ জীবনের কলনাদে ভরেছে অম্বর।
হে পঁচিশ নম্বর
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি।
রৌদ্রস্নাত খাটুনির পর সমস্ত দিন
মেরুদণ্ডহীন
মানুষগুলিকে সম্মান করে,
ঘৃণা করে আর হিংসা করে,
নগ্ন নগণ্য সন্ধ্যাকে পাই
—তোড়াবাঁধা শ্মশানে পাঠাবার ফুল—
একটা অন্যায় শৌখিনতায় মন হারায় কুল,
ঘ্রাণ নিই প্রাণ ভরে।
হলদে আকাশ থেকে কার আশীর্বাদ যেন পড়ে ঝরে।
ছারপোকার দৈনিক খাদ্য হিসাবে তাই
খাটিয়ার ওপর বসি, বিড়ি ধরাই
আর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা রোজ করি—
দোহাই পতিতপাবন হরি,
আর নয়, আমার লম্পট প্রবৃত্তিগুলিকে,
দস্যু লোভগুলিকে,
চালান করো আন্দামানে।
তার মানে,
স্বার্থ, অর্থ,

জমিদারী অনর্থ,
টাকা, টাকা আর টাকা,
সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা।
শ্রান্ত শ্লথপদে তাই
তোমারই দিকে ফিরবার প্রেরণা পাই,
হে অনবগুণ্ঠিতা,
অকুণ্ঠিতা,
পঁচিশ নম্বর মধুবংশীর গলি,
তোমায় চুপি চুপি বলি :
আকর্ষণ ? অনেক অনেক আছে,
তোমার শীতে ঠাসা
অমাবস্যার বাসা
ইট বের করা দেয়ালের কোণে কোণে।
তেলমাখা পাঁচ আঙুলের দাগ, বোনে
পুরনো স্বপ্নের জাল,
মলিন জীবন মহীরুহের ডাল।
তারই নিচে—শ্রীহরি সহায়—আঁকা বাঁকা
কাঠকয়লায় আঁকা,
জগন্নাথের পট পেরেক দিয়ে আঁটা,
কোনো সিনেমা-বনিতার জঘন্য সুন্দর মুখ
আঠা দিয়ে সাঁটা
অপর দেয়ালে। এই আবহাওয়াই সার
অধমর্ণ অস্তিত্বের সাধু টঙ্কার।

কোনো কোনো ছুটির দিনে অবশ্য স্ত্রীর চিঠি পাই,

দেশান্তরের নিবিড় বাহুর আশ্লেষে সময় হারাই,
অক্ষম মিনতির সুর— পড়ি আর তুলি হাই।
তবু চিঠি পাই আততায়ী জীবনের
যখন চাল কিনি চল্লিশ টাকায়,
চায়ে চিনি খুঁজে পাওয়া দায়।
এরই অন্তরালে দ্বিপ্রহর দগ্ধ মরে শুকিয়ে
যাওয়া খড়খড়ে দিনগুলির উপর দিয়ে
দুর্মর বসন্তের দ্বিধাকম্পিত পদধ্বনি শুনি।
দশ আঙুলে নিংড়ে নেওয়া আয়ুর শেষ প্রহর গুণি
হঠাৎ চিঠি আসে,
কোনো তন্ময় মুহূর্তে।
জানলা গলিয়ে পিছন দেয়, কাশে
একটু জানানি হিসাবে। হলদে খামে পোরা
শ্রান্ত বিকেলের রং! ছোরা
শানিয়ে আসে রাত্রি,
ধীরে ধীরে বড়ো রাস্তার চৌমাথা পেরিয়ে,
হিংস্র আগ্নেয় কামনা নিয়ে—
মত্ত আততায়ী আসে—রাত্রি
অনন্ত পথযাত্রী,—
মিলিটারী লরীর ঘর্ঘর,
রিকশ'র নুপুর, সুদূর ট্রামের মর্মর,
ধাবমান মোটরের ক্ল্যাক্‌সন্‌ হর্ণ, আর
মেঘে মেঘে এরোপ্লেনের শব্দের ভার
আকাশ ছেঁড়ে; পঁচিশটা,—
হবে,— চট্টগ্রাম ফেরতা ত্রিশটা,

হবেও বা,—কিন্তু হে অনন্তযাত্রী।
হয় নাই এখনও, হয় নাই শেষ তোর রাত্রি।
আতঙ্কের ঘোমটাপরা রাস্তার আলো
অভিকৃত কালো কালো,
নৈশজীবনের ছায়াদের ডাকে,
ঘরে বাইরে জানালার ফাঁকে ফাঁকে।
নিরুদ্ধ তৃষ্ণার তাই খুলে যায় খিল,
চলে রণদগ্ধ জীবনের ছায়ার মিছিল,
ক্ষুধার হুঙ্কারে ডোবে উন্মার্গের গান।
বাঁকা টুপিপরা কোনো আমেরিকান
কাপ্তেনের লোলুপ শিস
তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে। সামরিক আশিস
ঝরে পড়ে বিধ্বস্ত মাথায়,
চালে ডালে কাপড়ে ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায়।
কিন্তু ওরা আছে বেশ।
(এ যাত্রাই অবশ্য শেষ)
যারা মধ্যরাত্রে অগাধ নীলিমা চষে নিরীহ ঘুম ভাঙায়,
জেলেদের মতো তাজা মাছ তোলে ডাঙায়,
যারা তোমার আমার অবসরের গান ভেঙে চুরমার করে।
মুক্ত প্রাণে মুক্ত ইচ্ছার সিন্দুকে তালা পড়ে,
শ্লোগানমুখী মন শানানো সঙীনের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে,
ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সঙ্ঘে যোগ দেয়,
মুখে মুখে ফোটে বিদ্রোহের দস্তুর হাসি,
আর, বুকে সামাজিক যক্ষার কাশি।

তবু এক ফালি চাঁদের পিঠে ভর করে রাত্রির আকাশ,
আর সপ্তব্যাহৃতি মন্থন করে অসীম নীল বাতাস,
উঠে আসে শ্রান্ত অন্যমনস্ক পৃথিবীর উপর।
ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বের ক্লিষ্টগতি ভঙ্গী আনে তারই মর্মর।
পারিশ্রমিকহীন শ্রমে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া আয়ু
নিয়ে, রুগ্নস্বপ্ন দেখি, দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায় বায়ু।
তবু, তোমার চিঠির উত্তর দিয়ে যাচ্ছি ঠিক, প্রতি সপ্তাহে
একটা করে
মল্লিক বাগানের চুরিকরা ফুল খামের ভিতর দিই ভরে।

তারপর, বর্গীরা আসে।
আকাশে বাতাসে স্থলে জলে দস্যুদের দুরন্ত পদধ্বনি। ত্রাসে
প্রকম্পিত মৃগীদের মন। অলস দুর্বল স্নেহ কুড়িয়ে নেয় প্রচণ্ড
সুখ।

অগ্নিবর্ষী সকাল বাজালো তূর্য।
মনে হয়, জীবনের যুদ্ধ এল।
কলোনিতে কেরানীরক্তে প্রচণ্ড দোলা,
গম্ভীর স্থির প্রতিজ্ঞাগুলি সারি দিয়ে দাঁড়ায়
ত্রস্ত মনের সামনে প্রহরার মতো :
আমাদের প্রত্যেকের ইঁদুরের মতো মরাই শেষ নয়,
তারপরেও মহত্তম ভবিষ্যৎ।
আপাতত তার আগে পলাশ-রজনীগন্ধা-কিংশুকের
পাঁপড়িগুলি ছিঁড়ে কুটি কুটি
ঝড়ের নখরাঘাতে ; মেঘে মেঘে বজ্রের ভ্রূকুটি।
তা হোক অস্ত্রোপচারও আরোগ্য এই ভরসায়

সকালে উঠি, মাটির ভাঁড়ে চা খাই,
চালের দোকানের সামনে সারি দিই,
সন্ধ্যায় সমীকরণ সমিতির মিটিং থেকে ফিরি।
পাগলেরা বলে কি! সমীকরণ আপনিই হবে
কোনো এক অনিবার্য অমোঘ মুহূর্তে।
ইতিমধ্যে হাত পা ছুঁড়ে যাও,
অদৃশ্য অস্ত্র শানাও
কিছু কিছু মারকাটও চলুক,
যে যাই বলুক
গূঢ় স্বার্থের খেয়ালী আবহাওয়ায় পাল তুলে দাও।
অর্বাচীন! অর্বাচীন!
জানে না সে দুর্ধর্ষ জাপান আর পর্যুদস্ত চীন।
অর্থাৎ কে যে শত্রু ঠিক নেই, নিজেরাই মারামারি করছি,
ঘরে বাইরে মরছি।
শেষে বন্ধু পালের নির্বোধ চিৎকারে সভা ভাঙে,
আমার মনও। সাময়িক যুদ্ধবিরতি। মরা গাঙে
বান ডাকায় দিনান্তের পরিচ্ছন্ন মর্ষিত মন
অবসন্ন শান্তির স্রোতে।
তাই নিরঙ্কুশ, পবিত্র, নির্মনন অস্তিত্বের পৌরাণিক পুরে,
বাইরেকে ভুলি, ঘরকে ডাকি
একটা বিশুদ্ধ বিশ্রম্ভালাপের ডিকাডেণ্ট সুরে :
শোনো,
তুমি কোনো,
বরযাত্রার মিছিলে কখনো
বাঁশী-পতাকায় আলোতে মাখানো

নবযাত্রার মিছিলে দেখেছ রূঢ় বিধাতার হাসি।
দূরে,
অতিদূরে,
শ্যামলিম কোন্ মেদুর সুদূরে
চেন নাই বুঝি পরাণ বঁধুরে
স্বল্প আলোকে কান্নায় ঢাকা ব্যথা মুকুলিত হাসি।
উদ্দাম ভালবাসি
তোমার তন্ময় ধ্যান হয়েছে আকাশ পৃথ্বী
পর্বত প্রাকার—
ধরো, এই ভাবেই যদি বা বুঝাই তোমাকে
তোমার বিকল মনকে—অধুনা যা বিরস মলিন,—
কিংবা পাহাড়ে পাহাড়ে একাকার এই কাজের দিন
তোমার মুখেই বাঙ্ময় এই পাইন বন—
শুনে বলেছ হেসে,
রূঢ় বন্ধুর ধারালো চূড়ার এ সমাবেশে,
চলে যাই দূরে, পার হয়ে যাই ঘুমের শেষে—
বলেছ হেসে।
কিংবা, তোমাকে করেছি লক্ষ্য হে অনন্য গতি
রৌদ্রের মুকুটপরা প্রাণঃপুত দিন।
বিচক্ষণ বণিকের অন্যায়ের আভা
আর মুগ্ধ করে না অগণিত মন।
সম্রাটের অনুকম্পা, প্রভুহীন করুণ কুক্কুর,
পথে পথে ফেরে, দুস্থ শহরে শহরে
শেষ অপমৃত্যুর প্রহরে।
কাহারও পরার্থপ্রজ্ঞা সভাতে সঙ্গতে

ছিটায় শান্তির কণা, গলিত তুষার।
বক্তব্য আমার
এই, যে আমি বহুবার
শিল্পিত মনের চারু বনেদী ভঙ্গীতে
প্রেম নিবেদন করেছি। সঙ্গীতে
ফুটো ঘর ভরিয়েছি কিংবা কূট কবিতার
মহিমায় আত্মপ্রসন্ন হয়েছি।
কিন্তু মন পেলাম কই,
কর্মের প্রভায় উজ্জ্বল, এই করুণ গানের উপনিবেশে !
কাউকে তো দেখি না বেশ বলিষ্ঠ হেসে
জীবনের দ্বিধান্বিত মুঠোয় চাপ দিয়ে
শক্ত করে ধরে পৃথিবীর কঠিন জাগ্রত পিঠের উপর
চলে ফিরে বেড়ায়।

পট যায় ঘুরে।
অন্ধীকৃত রাত্রির শহরে,
পথে পথে সুগম্ভীর ছায়ার বহর,
ষড়যন্ত্র সঙ্কুল ত্রস্ত কবন্ধের ভিড়।
সুর-রিয়ালিস্ট কবিতার দেশে।
পিকাসো বা যামিনী রায়ের আঁকা
পথঘাট গাছপালা বাড়ী।
উর্ধ্বে নীলে আঁকাবাঁকা চাঁদ,
তারই নীচে নিরন্ন বুড়োবুড়ীদের চাপা আর্তনাদ,
ক্লিষ্ট চলাফেরা।
অতঃপর ব্রাহ্ম মুহূর্তে, ঘর্মস্রাবী রাত্রির ওপারে

আলোকসম্ভবা উষার ওষ্ঠপুটে ভৈঁরোর অস্ফুট আলাপ
ক্ষুধার গর্জনে ছিন্ন প্রশান্ত গৈরিক।
অগণন বালকবালিকাদের
বুভুক্ষা মুখর যাত্রা লেক মার্কেটের দিকে।
নিশ্চিন্ত অবিবেকী মনের শৌখিন গান
তিরস্কৃত, পলাতক দিশাহীন দূরে।
তবু ভাল, আমি এই মধুবংশীপুরে
আছি বেশ ; এ বেলা ও বেলা
কেটে যায় ব্যর্থ অন্বেষায়।
তোমার মহিম্ন স্তোত্রে মুখরিত আকাশ বাতাস
হে স্বর্ণবণিক ! তুমি দীপ্ত হিরণ্ময়।
তোমারই হোক ক্ষয়, হোক ক্ষয়।
(আজ শুনি এক ভরি সোনা একশো ছয়
টাকা।) বুভুক্ষারই জয়।
এ স্বর্ণসন্ধ্যায়
কাতারে কাতারে জমে হিরণ্য শকুন
ডানার ঝাপটে কাঁপে আদিগন্ত স্থবির আকাশ
প্রচ্ছন্ন শবের দেশে।

হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি আর এক কথা।
এই তো সেদিন, ট্রেন থেকে দিলো নামিয়ে,
হাতের তলায় সযত্নে চাপা অচল পুরনো টিকিট,—
দিলো কে নামিয়ে অচেনা স্টেশনে
জীবনের ট্রেন থেকে।
তাই সেই থেকে

বারবারই অক্ষম প্রয়াস,
চলন্ত রথের পানে খঞ্জের দুরন্ত অভিলাষ
ব্যর্থ হয়, চূর্ণ হয় ঘৃণার পাহাড়ে।
দূরে চলে ট্রেন
দ্রুত··· চক্রকঙ্কন ঝঙ্কারে।
সম্রাজ্ঞীর মতো উপেক্ষায়, ফেলে চলে যায়।
আমি থাকি পড়ে কোনো বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
শেষহীন চাঁদছত্র উপত্যকায়।
চলেছি কোথায় ?
একাকী ?   ইশারায়
মনে পড়ে দিয়েছিল কেউ এ প্রশ্নের উত্তরও।
একাকীত্বের শৌখিনতায়
সমীক্ষার ক্রূর শ্লেষ হেনেছিল সেও।
(তখন অবশ্য বড় জোর
শ্মশ্রুহীন কৈশোর,)
শিল্পকে কাব্যকে বাঁচাবার জন্য তবু
বলেছিলাম, তুমি তো আজো এই মুখেরই প্রভু,
হে অনন্ত প্রেম !
এই জীবনের সান্ধ্যসভায়
তোমার আসর শূন্য হলো
হে প্রেম শূন্য হলো, বিরস গানে
ভরলো আকাশ -- (লাগছে না ভালো বলছ ?
থামা যাক তবে।)
একাকীত্বের দুস্তর প্রান্তর থেকে কবে
উত্তীর্ণ হলাম উদ্দাম শহরে।

ব্যবহারে, বাণিজ্যে
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জোট বাঁধে মনে প্রাণে।
নির্জন শীর্ণ একতারা ডোবে সহস্রের ঐকতানে।
এখন চিনেছি যদিও, আরো অনেককে চিনেছি এবার,
অজ্ঞাতবাসের কঠিন আস্তরণ ভেদ করে
বুঝেছি এবার।
দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবা ভগ্নজানু মন,
তোমাকে দেখেছি বারবার এ শহরে হে দুর্যোধন।
লালসার জতুগৃহে ভস্মীভূত তোমার চক্রান্ত
এনেছে যুগান্ত।
অর্জুন, অর্জুন শুধু।
অর্জুন, অর্জুন আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন
দোর্দণ্ড গাণ্ডীব তাই অতি প্রয়োজন,
বৃহন্নলা ছিন্ন করো ক্লীব ছদ্মসজ্জার ব্যসন।
বিদ্রোহের শমীবৃক্ষে সব্যসাচী অর্থ খোঁজে আজ।
ঘৃণগ্রস্ত এই যুগ মৃত্যুজ্বরে কাঁপে হাড়ে হাড়ে,
আরক্ত সূর্যের অস্ত পশ্চিমের রক্তিম পাহাড়ে।

এই বার্তা তৃপ্তি দেয় আমাদের
যাদের,
মন রাঙিয়েছে আগামী যুগের রাঙা আলোয়,
আগত যুগের 'কামারাদেরিতে' যারা মুখর,
আমরা তো জানি স্থির বিশ্বাস করি সবে—
ইতিহাসই দেয় আগুনের রঙে সে স্বাক্ষর।
শোনো শোনো তাই,

হে নবীন, হে প্রবীণ, মজদুর, ওহে কৃষাণ,
ওহে মোটা সোটা বেঁটে খেটেখাওয়া কেরানীদল,
হে কাব্যে পাওয়া পলাতক ক্ষীণ কবির দল,
শিল্পীর দল,
হে ধনিক, হে বণিক, আর্য, অনার্য
করো শিরোধার্য—
বৃদ্ধযুগের গলিত শবের পাশে,
প্রাণকল্লোলে ঐ নবযুগ আসে।
প্রস্তুত করো তোমাদের সেই সব দিনগুলির জন্য
যখন প্রত্যেক সূর্যোদয়ে পাবে নবজীবনের স্তোত্র,
প্রখর প্রাণরৌদ্রের পানীয় তোমাদের আনন্দিত করবে,
(দুর্বলদের নয়।)
শতধা সভ্যতার পাশে,
লক্ষ কোটি ভগ্নস্তূপের পাশে,
বিদীর্ণ আকাশের নিচে,
উপদ্রুত ঘুমের শিয়রে,
ছিন্নভিন্ন পৃথিবীর বসন্তের পাশে,
লক্ষ লক্ষ নির্জন নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়ার পাশে,
দ্বিধাদীর্ণ জনগণমনে
মহা-আবির্ভাব।
স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে
স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়, টিউনিসিয়ায়,
মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।

উড়িয়ে দেবে দিগ্বিদিকে
শুকনো ধুলো
শুকনো পাতা
ঝরিয়ে দেবে।
অন্ধকারের দুর্গের সিংহতোরণ
গুঁড়িয়ে দেবে।
ইতিমধ্যে প্রস্তুত থাকো সবাই
যখন অত্যাচারীদের পতন—
চরম পতন হবে।
প্রাসাদে, বন্দরে,
বাহিরে, অন্দরে,
প্রতি গ্রামে, নগরে,
লক্ষ লক্ষ মনে, দেশে দেশান্তরে,
নীরন্ধ্র নির্মম পতন।

তারপর, অবকাশ।
রাত্রি উঠে আসবে গাঢ় নীল,
স্তব্ধ ডানা পৃথিবীর নীড়ে আসবে নেমে
সুস্থকামনার স্বর্ণচিল,
প্রতিদিনের জ্বলন্ত অস্তের পর,
শ্রম বিরতির পর।
তারপর সুস্থ মুক্ত অনর্গল প্রাণসঙ্গিনীদের নিয়ে
আবিশ্ব প্রাণ-নৃত্যের আসরে
জমবে ভাল, জমবে তখন
মধুবংশীর গলি,
বজ্রনিনাদে তোমাকেও ডেকে বলি॥

ইতিহাস, সমুদ্র ও প্রেম

এখানে আস্‌তে গিয়ে যদি খোঁজো
শিলীভূত ইতিহাস,
হঠাৎ ভাস্কর্যে স্তব্ধ, অমেয় আবেগে ঢাকা
নৈশবিহারীর কোনও আশ্চর্য পতন,
তা হলে এসো না।
আমাকে গানের সুরে ভেবো,
নতুবা অন্যথা হবে
তিলে তিলে মৃত্যু-ঋণ জীবনের কাছে।
নতুবা, রাগিণী অন্য গ্রহলোক খুঁজে
ধ্বংস হয়ে যাবে মরা চাঁদের মতন।
বহুদিন খুঁজেছি তোমাকে—
বহুদিন,
জ্যেষ্ঠদের ভ্রূকুটির কণ্টকিত নিষেধের নিচে,
আরও নিচে,
ক্ষীণ-মধ্য খাজুরাহো স্তূপের কিনারে,
বোধহীন অতলের কামস্নিগ্ধ অন্ধকারে
শবাচারী হয়ে।
নিরুদ্দেশ, গুহাহিত ছিলে।
হঠাৎ আগ্নেয় আত্মা নিয়ে তুমি
উজ্জ্বল হলে
সেদিনের ভোজে—,
জামদগ্ন্য অতীশের হাতে হাত দিয়ে
অরণি জ্বালালে।
এক জোড়া আবিশ্ব সে চোখে

দুর্ভিক্ষের হাহাকার কেঁদে উঠেছিল।
চোখ দিয়ে শুন্‌তে পাওয়া যায়।
স্তব্ধ স্তবে আকীর্ণ এ প্রাণের আকাশ
সব শুনতে পায়।
অযথা সংঘর্ষ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে আলাপের
আসরে ভিড়ো না,
তুলো না বিতর্ক এই মুখোশ-নগরে।
বরং বিপ্লবগুলো রৌদ্রে ধুয়ে নিয়ে
বজ্র করে' নিও এই নির্মম প্রণয়ে॥

তারপর সমুদ্র !—
মৃতপ্রায় সূর্যের আত্মীয়েরা—
আতপ্ত স্খলিত বালু,
বৎসরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
তোমাকে এনেছে ফেলে
নৈশ ভোজ-পার্টির ককটেল ভেঙে
তরঙ্গের তীরে।

আপাতত, এখানেই,
একটু আরও কাছে এসে বসো,
দুহাতে নিংড়ে নিয়ে ফাল্গুনের
দ্রাক্ষাকণাগুলি।
ধুরন্ধর অতীশেরা ইতিহাস মানে—
হলুদে রং পাতা হয়ে ঝরে যাবে সব
কালের সন্ততি।

আশ্লেষ-জর্জর
অসপত্ন হবে এই নিষ্পেষিত আঙুলের চাপা-
এখন ভেবো না।
নির্মনন হয়ে যাও—, ওষ্ঠপুট তুলে ধরো
যুগ্ম মীন-মিথুনের থরো থরো শরীরের মত।
স্তন্যপায়ী কামনার হাতে রাখো হাত,
উত্তুঙ্গ যৌবন নাও শাস্ত গরিমায়।

এখানে নির্জন,—তবু আসতে চাও
এসো তুমি।
স্তূপে স্তূপে ভয় জমে আছে,
উপনিষদের প্রাক্‌পুরাণিক পুরুষের হাতে।
রম্য রচনার মত তুমি অদ্বিতীয়া,
এখানে অজস্র হও লক্ষবার পরিণীতা হয়ে।
আমি আছি তোমারই শরীরে,—
চিরশ্যাম অরণ্যের মত॥

উৎক্রান্তি

॥ এক ॥

একটা মৃত্যু হল।
সমস্ত আকাশ জুড়ে শেষহীন স্তব্ধতার
সমুদ্রের নীলে,
প্রসিদ্ধ গুণ্ডার এক শ্রান্তঘুম মৃত্যুর মত।

আমার বাঁচার শেষে তুমি আছো
প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে—
প্রথম যেদিন সেই আনন্দের ভ্রূণ,
চোখ মেলেছিল।
তুমি আছো অন্য এক 'আমি'র দ্বৈরথে
অসংখ্য মিছিলে মিলে একাকার
পাথরে পাহাড়ে জলে ঝর্ণায়
শহরে গ্রামের ঘন নিশ্চিন্ত গুহায়—
সবমিলে একাকারে বিচিত্র এ স্রোতে—
প্রাগৈতিহাসিক সেই সত্তার জটিল গহনে।

তুমি তো জান না,
তোমার জীবন নিয়ে লক্ষ লক্ষ হাত
শ্যামল তৃণের মত শরতের সূর্যকে খোঁজে
একটা জীবন নিয়ে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর জীবনে॥

প্রচণ্ড বর্ষণ-সিক্ত পাতাদের পাড়ায় পাড়ায়
শেষ হল ইতিহাস
সন্তপ্তমরুর দাহ, বর্ষার দীঘির কিনারে॥

॥ দুই ॥

এখন উন্মুখ সব চড়ুইএর ডানা—
শরতের নীল মুদ্রা
হাল্‌কা মেঘের মুখে ইতস্তত ভাসে।
আমাকে মুদ্রিত করে অস্তিত্বের দেয়ালে দেয়ালে
জীবনের নব হস্তাহার।
এসো যাই প্রান্তরে—ঝর্ণার উৎস-মুখে
একটি পাহাড় ঘেঁষে—
হাতে হাত দিয়ে একটি ছুটি-মাখা পথে
আবেগের ঢালু ইসারায়—
পৃথিবীর কোন এক শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের মত ॥

এখনও আনন্দ পেতে কিছু বাকি আছে।
একটা মাছের মন, রূপালী আঁশের আলো
সূর্যকে ঘিরে নামে জলের অতলে
শৈবালে শৈবালে তার ইতিহাস জড়ো হবে
প্রবালের স্তূপে।

আমার এ মীন-সত্তা তোমাকেও মৃত্যু-স্নানে
টেনেছে কখনও। যুগ্ম দিন-রাত্রির নীল সরোবরে
প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু পিছে ফেলে এসে—
ধীরে ধীরে নীল হয়ে দিগন্তে মিলায়
দ্বৈত-সত্তা কপোত মিথুন।
এখানেও সাক্ষী আছে—
রাত্রি-শেষ ক্লান্ত চাঁদ চৈতন্যের সীমান্ত প্রহরী ॥

॥ তিন ॥

তুমি হাত ধরতে চাও, ধরো হাত,
এখনি বসন্ত আসবে,
অনেক দূরের বনে নিশ্চিত মৃত্যুর মত
অথবা ঘাসের নিচে,
অসংখ্য বীজের মৃত্যু নিয়ে।
কারণ, এ কাল হবে প্রত্নাগারে
পরশের গূঢ় গবেষণা—
নূতন প্রাণের চোখে অধ্যাপক বিস্ময়ের
অনন্ত শুশ্রূষা!
তবুও ধরবে হাত, ধরো, কিন্তু
তোমার বিভিন্ন সত্তা
আমাকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে
প্রাণান্ত সীমায়,
গণিতে অঙ্কে শেষ-অঙ্ক যবনিকায়
তোমাকেই মুগ্ধ ক'রে আমার সমস্ত দিন,-
প্রতিদিন মরে, মরে গেছে,
প্রতিদিন সূর্যের সাথে ॥

॥ চার ॥

সকালটার মুখে কিছু বক্তব্য ছিলো,
বলে গেল না—
বেলা দশটা হয়ে
শহরের ক্ষিপ্ত জনতার

মিছিলের ক্রুদ্ধ স্বর পার হয়ে
মূলতানের তীব্র মধ্যমে পা দিয়ে
দ্বিপ্রহর অপরাহ্ণ হয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে মিশে
হয়ে যায় নীল
পাহাড়ের কোলে।
এখানেও নির্বিশেষ শেষ হওয়া আছে—
তোমার বক্ষের পাশে
আমার বক্ষের দ্রুত স্পন্দনের নাচে।
তোমাকে কিন্তু বেশ লাগে—
রাস্তায় চলা পসারিণীদের পাশে
বেশ লাগে—
অনিকেত লিপ্সার সর্পিল শাড়ীর প্যাঁচে
আমাকে বেঁধেছো গুচ্ছ করবীর সাথে ॥

॥ পাঁচ ॥

আমার এ গান থাক,
একটি ম্লান তপস্যার মত, তোমাকেই ঘিরে—
আমার এ মন তাই উন্মুখর,
একটি নাম উচ্চারণে—
সমস্ত জীবন জুড়ে একটি নাম
নামাবলি আকাশের তারা ॥
তোমাকে পেয়েই কিন্তু চলে গেছি বন্দরের দিকে
জাহাজঘাটায়—,
চটুল নাবিক হয়ে।

দূর দূর বন্দরের নাম
পড়ে দেখি বিদ্যুৎ জ্বালায়—
আর ইসারায় ডেকে নেয়।
কামুক মার্জার ঘোরে মার্জারীর পিছে।
অসংলগ্ন প্রলাপের গান, মাতালের দেহে
চরম বিনষ্টি নিয়ে সূর্যের মত শুধু হাসে—
ফাল্গুনের মত্ত সূর্য।
দূরে দূরে কত দেশে, বাগানে ও বনে
ফুল ফোটে—
পক্ক ফলে বাতাস মন্থর।
দেখেছি দেশের মুখ—কত দেশ!
মেয়েদের মুখে—সিনেমায়—ব্যালেরিনা—
অন্ধকারে মুখের সান্নিধ্যে মুখ,
হাতের চাপেতে বুঝি, আমাকেই চায়।
আপেল আঙুর আর ডালিমের পাকা ক্ষেত,
ধানের সোনার শিষে,
দেহের খাদ্যে সোনা মেশে।
দেখেছি,
অনেক দেখেছি,
তোমাকে মিলিয়ে নিয়ে বন্দরে বন্দরে॥

আগ্নেয়গিরির লাভা,
দেশে দেশে বিদ্রোহের মূর্তি—
মানুষ মানুষকে চায় পাকাপাকি ভাবে।
তোমার আমার মাঝে দেশে দেশে

সহজ গানের কলি—সীমান্ত সেতুতে।
সে গানের বিরুদ্ধে আনে ক্ষেপনাস্ত্র
অদ্ভুত নাটক!
গম্ভীর মৃত্যুর মত মেঘের গর্জন॥
অনেক বলেছি—
রাত্রির গায়ে কান দিয়ে
শোন্‌বার মত সব কথা।
অনেক গেয়েছি গান।
এখন তোমাকে দেখছি স্তম্ভিত,
শেষ নাটকের পর্দায়,
অত্যন্ত সহজ এক নায়িকার মত।
হয়ত বল্‌তে পারতাম
আমারই লেখা কোনো বিশ্রী কবিতার ঢঙে—
"রাত-জাগা পরিচিত টিকটিকির লেহনে লেহনে
ঘরের মনের রূপ তোমাকেই করে দেয় শাদা
রক্তহীন পাখীর কঙ্কাল—"
তবে, আজ তা বল্‌ব না।
কারণ, এখন আর অনেক সময় নেই
কিম্ভুত হবার॥

আনত সপ্তর্ষির নিচে দেখা যায় সেতু—
ভাবী পদশব্দ শোনে
আমাদের যাত্রার বিদ্রোহে।
পার হতে হবে সব,
বন্দরে বিদেশে দেশে—

হিংসা, ক্রোধ, প্রেম আর ঈর্ষার মেঘ,
পার হতে হবে সব—
মৃত কঙ্কালের গান—খাজুরাহো ব্যাবিলনে,
বোরোবুদুরের চূড়া,
(তোমার জন্মদিনে দেওয়া মহার্ঘ রুমাল)
সব পার হতে হবে।

দেখেছ সে সেতু ?
ঐ দূরে, সহস্র জন্মের পারে,
মৃত্যুর সূর্যের রঙে সোনা-রং-মাখা।

এবার হাতটা দাও জন্মের মত,
নিবিড় ভাস্কর্যে এক শিলীভূত গান।
তোমাকে আমাকে ঘিরে নির্বেদ, অনীহা
খুলে নিয়ে যাবে যুগ-যুগান্তর হতে।
এখনি শুনতে পাবে ঘণ্টার শব্দ।
মৃত্যুর তীর্থে তীর্থে সেতু-সাম গান ॥

রাজধানী

ইতিহাসই জানে, আর তুমি জানো নাজির হাসান,
দরিবা কালানে এক পুরোনো দালানে বসে—
আঁধিলাগা দিল্লীর ঘোলা-আকাশ চোখে
তুরুক্-সওয়ার ঘোড়া খুরে খুরে শব্দের স্বপ্নই দেখো।
এখন হঠাৎ টুক্‌রো বর্তমান নিয়ে,
টাঙ্গাওয়ালা, স্কুটারের শব্দ ধাবমান,
মন্‌সবদার কোনো বাস থেকে নামে—,
ফর্‌সীর নল মুখে চম্‌কে ওঠো নাজির হাসান ॥

অনেক দূরের পথ—ইন্দ্রপ্রস্থ পার হয়ে,
অতিবৃদ্ধ পিতামহ রাজধানী পাশা খেলা হেরে,
যুগে যুগে পাঠান মুঘল্ রাজ্যে যুধিষ্ঠির হয়ে
মিশে গেছে ইংরাজের কালে।
এখন পাণ্ডব-পণ্ড ইন্দ্রপ্রস্থে, পাণ্ডুর বাতাসে,
বিবস্ত্র বেপথু কোনো দ্রৌপদীর কান্না নিয়ে,
আধুনিক রেডিওর গান, আর রাস্তায়
বরাত্-মিছিলে, মেশে সিনেমার ধুন্।
শ্রদ্ধা হয় তোমাকেই, তোমার এই বিচিত্র কেলাসে,
সময়ের মদ পান করে মত্ত সুচারু গেলাসে,
রাজধানী ছিলে তুমি সিপাহী বিদ্রোহেও—।
রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে ফাঁসীকাঠ, খুনী দরবাজা
হুঁশিয়ারী চীৎকার !—ক্ষুধিত পাষাণ !

একটি প্রবল ইচ্ছা সমবেত হয়ে,

মরে মরে ধূলি হয়ে গেছে সব দিল্লীর রাস্তায়।
তবু, কতখানি সব মনে আছে তোমার জানি না
নাজির হাসান,
সেদিনও যেমন,
এখনও অগুণ্‌তি সব সবুজ টিয়ার ঝাঁক
ময়ূরের বর্ণালী বিলাস,
সন্ধ্যার আরক্ত আকাশ আর লাল কেল্লা ছুঁয়ে
যমুনার পারে উ'ড়ে যায়, বর্ণাঢ্য পাখায়—
লাল-নীল-সবুজের শামিয়ানা
ঢেকে রাখে আকাশের চোখ।
শাহ্‌জাহান আলম্‌গীর বাহাদুর শাহেরাও
দেখে গেছে সব—
হাতির পায়ের তলে অপরাধী পেষা।
ঘাম আর গায়ের রক্ত জল করে করে,
গড়ে তোলে সাধারণ লোক,
ভাস্কর কামার,
নিষ্ঠুর প্রতিমা সব
প্রাসাদে মঞ্জিলে।
এরই নর্ম বিচিত্র আড়ালে
চাঁদ্‌নি চকের কোনো অন্ধকার গলির গহনে
তোমাকেও টেনেছিল, নাজির হাসান,
সুরমাটানা মৃত্যু হানা চোখ
তুর্কী সুন্দরীর।
তোমার যৌবন ছিল আঙুরের মত,
নিটোল, মদির॥

আজ সবই ইতিহাস— ।
অথচ তুমি ও আমি, আমরা সবাই
এখানেই আছি, এই রাজধানীতেই
মিলে মিশে এক গালিচায়।
ওপরে, পালাম্ থেকে জেট্ প্লেন্
পুরোনো আকাশটাকে ছিঁড়ে চলে যায়।
সন্ধ্যা নামে, শবাচারী শকুনের ভিড়ে—
আগুনের আলো জ্বলে, হল্লা শোনা যায় দূরে,
রাস্তার মোড়ে।
আমি সেই মন্‌সবদার, দিল্লীর বাস থেকে নেমে
জানাই সেলাম—।
পুরোনো কালের ঢুলু ঢুলু চোখে
চারপাইএ উবু হয়ে বসে,
ফর্‌সীর নল মুখে চম্‌কে ওঠো নাজির হাসান ॥

অনেক সপ্তমী

মনে মনে ভেবে দেখে'
ঠিক কবে আশ্বিন আকাশ,
ওড়ায় চিলের ঘুড়ি—
আনন্দ উড্ডীন্ সূত্রে,
ছেলে-মেয়ে, খেলা-মেলা, দোকান দোকানী সব,
ঘোরে ফেরে দিনাবর্তে নাগর দোলায়।
নতুন জলের স্রোত,
শৈবাল-মাটির মৎস্যগন্ধী জল, কাশফুল-বন,
আবর্তিত নতুন উল্লাসে।
শহরে প্রবাসী বুকে অবিভক্ত বাংলার
শান্ত শ্যামল কথাগুলো—
বার বার ফিরে আসা শরতের খঞ্জনের দল।
মন-দর্পণিত চাল-চিত্র দূর মোহানা পেরিয়ে
বাঁক, নৌকা সারি সারি।
ডিমি ডিমি ঢাক ঢোল কাঁসি উলুধ্বনি—
বাঁশঝাড় ঘেরা গ্রাম
আশ্বিন আকাশ আর
চলন বিলের পার—আলোক-ছুয়ার।
কেমন অদ্‌ভুত সব—আগমনী পূজা-পূজা ভাব!
গলার নিচেই ঠিক কাঁপতে থাকা আবেগের মত!

আজ সেই আবার আশ্বিন,
আর অনেক অনেক বার ঘুরে আসা আমি,
পৌঁছে গেছি পার হয়ে অনেক সপ্তমী॥

পরে হয়ত প্রেমে ডুবে যাবে

আপাতত ব্যক্তিত্বের ভ্রূণে
ছোট শিশু হাতে, চড়ুই বা পায়রার দিকে
চঞ্চল দৃষ্টি হানে।
এখন শরৎ-শিশু
আধো-বুলি-অনুভবে
আশ্চর্যের রসে মগ্ন।
কালো কোঁকড়া চুলের গভীরে
নভোচারী মনেদের বাসা।
অভিযান আছে সামনে প্রান্তরের মত
কিশোরের বিজয়া দশমী—
অনাগত যৌবনের আগামী বাসর।
আপাতত নান্দীমুখ—,
আবোল কাকলি হাসে
রৌদ্র-ছায়া—আকাশ
ও পাখীর ডানায় হাততালি দেয়।
পরে হয়ত প্রেমে ডুবে যাবে॥

তোমাকেও চিনি

যখন আকাশে মেঘেদের সংঘর্ষ,
উড়ন্ত চিলেদের বাঁকানো ঠোঁট থেকে আহত পাখির ছানা
পড়ে যায় নিচে,—
নিষ্ঠুর লীলায় ভরে পৃথিবীর আকাশ বাতাস,
তখন রাস্তার ধারে মুদির দোকানের পাশে
ছোট্ট এক মেয়ে ঠোঙা থেকে মুড়ি নিয়ে
একটু একটু খায়,—
আর আকাশের চঞ্চল সবুজ ঘুড়ির উড্ডীন আনন্দের দিকে
তাকিয়ে থাকে।
পৃথিবীর প্রথম আলোর মত
সহজ এ আনন্দিত মনকেও চিনি ॥

আবার যখন সামাজিক ব্যবসাদারদের হাটে ধূলিধূসরিত
কায়মনোবাক্যে একটা ঘৃণার স্রোতে অবগাহন করি,
ঘর্মসিক্ত অবসাদ ঘিরে ধরে রাখে,
তখন ক্লান্তি আর ভ্রান্তির গলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
মরীচিকার মত তোমার পেশাদারী মুখ কৃত্রিম আহ্বানে
আমাকে গ্রাস করতে থাকে
একটু একটু করে—
অরণ্যের ভয়াল ময়াল।
মৃগয়ার এ অরণ্যে তোমাকেও চিনি ॥

বোকারো

এখনি এখানে এক অরণ্য-সন্ধ্যা নাম্‌বে
দেখে নিও পাহাড়ে পাহাড়ে।
অদ্ভুত ভূগোলে শাল মহুয়া পলাশে
লাল, বন্য দিন ঢুকে যাবে গুহায় গুহায়।
তোমাদের দূর কোনো সমতল শহরের থেকে
সন্ধ্যার বিদ্যুৎ-আলো ছুটে এসে এসে
ক্লান্ত হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্ধকার হয়ে যায়, আর
টিলার উজ্জ্বল ঢেউয়ে জ্বলে ওঠে অরণির সারি।
এ সমস্ত ভাবনার পিঠ বেয়ে বেয়ে দিন ডুবে যায়
রাত্রির তোরণ দিয়ে চলে যায় ওপারের দিনে।
সমস্ত পৃথিবী থেকে একটি দিনের আয়ু নিবে গেল বুঝি
তবু কত আয়ু সব জীবনের গায়ে লেগে লেগে
জ্বলে ওঠে তল-হীন সমুদ্রের
উজ্জ্বল মাছেদের মত।
যেখান থেকেই আসো, শহরের গ্রামের বনের,
ইতিহাস—সন্ততির মত।
শেষহীন গল্পের নায়ক নায়িকা সব
"আমরা" ও "তোমরার" এপারে ওপারে
পাড় বুনে চলো।
এই ইতিহাস নামে ভূগোলের রঙ্গমঞ্চে,
মুখোসে মুখের রং মানুষে মানুষে,
যুদ্ধে, প্রেমে বঞ্চনায়
উৎসবের রঙীন ফানুসে।
তবু ত এখানে এক আরণ্যক সন্ধ্যার তিমিরে

শান্তি নামে পাহাড়ে পাহাড়ে,
তারই অনুবাদে যেন পৃথিবীর ও প্রান্তেও নেমে পড়ে ঘুম।
শুধু জ্বলে বনের আগুন অন্ধকার মসৃণ শরীরে
শিকারী চিতার স্তব্ধ চোখের গভীরে—
পত্রঝরা রাত্রির ফাগুন ॥

মায়াবিনী

তুমি যে ভুলাও, ভুলাও কেবলি হে মায়াবিনী
অর্থ-চক্রে চক্রী প্রাণের। যে কিঙ্কিনী
শুনেছি যে কালে চরণের চারু হার্পসিকর্ডে
সে কাল তো গেছে। এ কাল ধূলায় ধূসরিত প্রাণ
চৈত্র গাজনে মাদলমত্ত ডমরু বাজায়॥

মনে হয় যেন কবে বা কোথায় দেখেছি যেন
মৃগ-নয়নীকে নারী-মজলিশে? লেকের ভিড়ে?
হবেও বা তা মনে নেই ঠিক। অথবা বোধহয়
গুরু ভোজনের স্বপ্ন-শিখরে অলীক এ মুখ।

এতদিনে দেখি তোমার সে মুখ হয়েছে পাথর।
আকাশে বাতাসে পথে প্রান্তরে মোহমুদ্গর
ভেঙে দিয়ে গেছে জীবনের মধু-প্রতিমাগুলি।
দীর্ঘশ্বাসে ভীরু হৃদয়ের শুক্‌নো পাতা
উড়ে গেছে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে ধূম্রলোকে।
পথ ভরে গেল মরণে, ক্ষুধায় হানাহানিতে
সশস্ত্র যত পাথুরে মানুষ মিতালী পাতায়।
বাহুতে তাদের কর্মী ত্যাগের প্রবল শিরায়,
ভাঙা ও গড়ার দ্বৈত ছন্দ নাকাড়া বাজায়।
তারপর, ক্রমে বন্ধু হাতের নিগূঢ় চাপে
চলে আসি ছায়া ছেড়ে রৌদ্রের প্রখর পথে।
হৃদয়ের মৃদু গান হ'য়ে উঠে বজ্রসম।
দেশের প্রতিমা, দেশের মানুষ—ভীষণ মধুর।

হঠাৎ এলো কি প্রলয়ঙ্কর হৃদয়-হরণ।
ধুয়ে মুছে দিল আত্মরতির সোনালী বরণ॥

আজ দেখি শুধু এদলে ওদলে কি হানাহানি,
অবিশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে লোকেরা বাঁচে।
মিলন মধুর এ আকাশ নেভে মেঘলা রাতে
যুদ্ধান্তেও যায় না যুদ্ধ। দেশের মানুষ
হাহাকার করে, অভিশাপ হানে নিজেরি মাথে।
এখনও তোমার নয়নধনুর কটাক্ষতীর
জন্মান্তরে এ হৃদয় পানে পাঠাবে না কি।
জনতার স্রোতে মিশে গেছি হায়, হে মায়াবিনী,
প্রেতলোক থেকে তবু বাজাবে কি সে কিঙ্কিনী॥

বিয়োগান্ত

মেরু-শৈত্যের আবেশ লেগেছে প্রাণে
তোমার তনুর ছায়ে।
নির্বান্ধব দিনের কণিকা
ভেসে যায় মেঘ পানে।
আহ্বান নেই,
নেই কোন মদিরতা,
তোমার তনুর ছায়ে।
মনে হয় মুছে ফেলি
প্রতি নিমেষের পরাজয়গুলি
জীবনের লিপি হ'তে।
একটি দিনের একটি না-শোনা কথা,
মৃত্যু পরশের নেশা,
থাকুক অসীম নির্মেঘ নভ হয়ে
আমার কামনা-নীলে।
শুধু যেন মুছে ফেলি,
প্রতি নিমেষের মৃত্যু-কাহিনী
জীবনের লিপি হ'তে।

জীবনের চক্রপিষ্ট পথে,
কোলাহলের উন্নত শিখরে,
রইলে তুমি বসে।
নাম্‌লে না বিবর্ণ দিনের মাঝে
প্রতিদিনের অখ্যাত যাত্রায়,
রতিহীন রাত্রের নীরব আড়ালে

তোমার অভাবটা শীত-ঋতু,
দুরাশার কুয়াশায় ঢাকা।
তুমি-হারা তাপাতুর জীবন আমার
নিভে গেল, নিভে গেল আজ
কম্পমান হৃদয়ের শীতল দ্বিধায়।
তোমারই ত অকরুণ নির্বাক দৃষ্টির নিচে
সোনালী নিমেষগুলি
মৃত্যু পেলো তিলে তিলে।

একটি সনেট

স্বপ্ন-প্রলাপ-মেদুর করেছে গতি।
স্বদেশ আমার, বিদেশ আমার, নতি
জানাই তোমাকে। আরক্ত ঋতু-রঙে
হিংস্র-কোমল কঠোর করুণ ঢঙে
বিচিত্র দিন, তবু তোমাকেই নতি—
বিদেশী স্বদেশ, স্বদেশী বিদেশ প্রতি।
জীবন ধারণে চক্র-ঘষার জ্বালা—
আশ্বিন দিনে তবু প্রেয়সীর মালা—।
তোমার আমার পয়ারে পয়ারে মিলে
জ্বলে ওঠে গান, ছন্দের এ নিখিলে।
কত না দেশের প্রভাতে সন্ধ্যা এসে
আকাশে আকাশে নীল বাহু মেলে মেশে।
ধ্বংসের পাশে তোমারই কোমল যতি।
সারা মানুষের স্বদেশ তোমায় নতি॥

রবীন্দ্র ঠাকুর

প্রথম কিশোর-চোখে মেলে ধরেছিলে দূর
প্রান্তরের আলো।
আনন্দের নবধারাপাতে কোন বিস্ময়ের ভাষা
ফুটেছিল মুখে। বাধাবন্ধহীন আশা
স্বপ্ন-ভঙ্গ নির্ঝরের দুরন্ত দুরাশা
রক্তের চঞ্চল গানে—তোমারই সে সুর!
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

বিচিত্র এ ঋতুজালে জড়ানো জীবন।
সোনার স্বপনঘেরা মাঠ পথ নদী বন পর্বত প্রান্তর,
জনপদবধূ গ্রাম পদ্মাপার দেশ-দেশান্তর।
বর্ষার আকাশ জুড়ে মেঘের মাদলে মত্ত
শ্রাবণী গাজন—
তোমারই যে ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রধনু মন।
মর্মে মর্মে ভরে দিলে বিচিত্র সে সুর
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

তোমার অরণ্য হতে ছিন্নপত্র ভেসে আসে
আমারই অঙ্গনে।
গন্ধ পাই, ফুটে গেছে শালের মঞ্জরী
দূর বসন্তের বনে
হঠাৎ-উধাও হওয়া সুদূর পিয়াসী মন,
রাঙামাটি-পথচলা প্রাণের বাউল—

আঙুলে আঙুলে কাঁপা একতারা হৃদয়ের তারে
বাজায় রাগিণী।

স্মরণের নীল পাখি ডানা নাড়ে প্রাণের গহনে।
জানা-অজানার মাঝে, দেখা-না-দেখায় মেশা
রহস্য-আলোক
জাগালো প্রথম শোক। অন্তর মন্থর করে
উঠে এলো আবেগের বর্ণলক্ষ্মী—বাজালো নূপুর।
সে তোমারই সুর জেনো, রবীন্দ্র ঠাকুর॥

তোমার বিহঙ্গ-মন হঠাৎ কখন নিচে
নেমে আসে মানুষের মনে
কালো মাটি দিয়ে গড়া পৃথিবীর বাসা—
তারই পরে করে ভর।
নিবিড় রসের ধারা পান করে তৃষিত অন্তর।
আমার চৈতন্যলোক আলোড়িত করে তুমি দিলে,
মানুষের সহজ নিখিলে।
তোমারই ঢাকীর ঢাক বাজে খালে বিলে।
তারই প্রতিধ্বনি ভরে বিপুল সুদূর—
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

অনেক তো দিলে তুমি
মধুর, শ্যামল, কান্ত জীবনের গান—
তোমার সঙ্গীতছায়াস্নিগ্ধ এ-পৃথিবী
চূর্ণ চূর্ণ হবে আজ, ভাবতেও পারি না।

দানবের ষড়যন্ত্রে
খাণ্ডবের দাবদাহ পলাশের বনে—
আণবিক ধ্বংসের প্রাঙ্গণে।
হিংসার বিষাক্ত বাষ্প গগনে গগনে।
তুমি তো জান না,
তোমারই সে-কৃষ্ণকলি
অনাহারে মরে ধুঁকে ধুঁকে কোনো অন্নহীন গ্রামে।
আবিশ্ব মড়ক নামে।
সে হরিণ-চোখ আজ তিলে তিলে যায় বুঝি পুড়ে
নিষ্ঠুর মৃগয়া চলে সারা বিশ্ব জুড়ে॥

তোমার প্রাণের কান্তি দাও আমাদের।
বজ্র হয়ে বাজুক এ বাঁশী।
দুর্মদ সুন্দর এক যৌবন-প্লাবনে
মৃত্যুর ভ্রূকুটি যাক ডুবে।
তোমার নামেই আমরা শপথ করেছি—
তোমারই দেওয়া এ গান, আকাশ আলোর হাসি
বিশ্বের অন্তরে রাখবো—আমরণ পণ।
আমাদের ঐকতানে তোমার এ অগ্নিবীণা বাজুক মধুর-
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

আরোগ্যেই যেন শেষ হয়

(বিষ্ণু দে-কে)

এখন কবির কাল শেষ যদি হয়,
অনুপস্থিত ছন্দ বাণপ্রস্থে লীন
যদি ভীরু থাশ্, গানের কলিকে ভুলে
নেমে যায় অরণ্যের নীড়ে,
যদি হয় আমার মুখের ছবি
তোমার মুখের মত শহরে শহরে,
সাহিত্যের রঙ্গনাট্যে কথাকলি মুদ্রার মৃদঙ্গ নর্তনে,
আমার আরোগ্য যেন
তোমার বুকেতে বাঁধে বাসা
পরিপূর্ণ সূর্যমুখী দিনের আলোয় ॥

অশ্লীল কুটিল এই জীবনের ওপারেই পলাশের বন।
শিমূলতলার গান, পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায়।
ওখানেই চলো, সেই প্রতিশ্রুত নিমন্ত্রণে,
ছায়ায় নিঝুম,
আলাপের রাগিণীর বর্ণচ্ছদে নীল।
অনেক দূরের পথ পায়ের পয়ারে ভেঙে
সাঁওতাল-রঙ ঝুম্কা কেলাসিত ডিগ্রিয়ার
ছন্দের গভীরে ॥
তোমার সুদূর উচ্চ স্বপ্নচূড় বাসা থেকে
আমাকে ডানার স্বাদ দিয়েছ কখনও।
কখনও বা সমুদ্র-গর্জন শুনি সে উত্তাল মনের মিছিলে,
বেটোফেন প্যাস্টোর‍্যাল পুরীর সৈকতে—

সেখানে তোমার মন ব্রেকারের সহস্র ভঙ্গে
আমাকে ছুঁয়েছে।
এখনও অনেক দিন প্রবল বন্ধুর মত
উত্তরায়ণ সূর্য দেবে আরোগ্য সংবাদ।
ততক্ষণ তুমি থেকো কাব্যের সত্তায়
সুস্থ আয়ু নিয়ে।
তোমার প্রগল্‌ভ গান প্রজ্ঞাপারমিতা
পৃথিবীর বসন্তের স্তব—
আরোগ্যেই যেন শেষ হয়॥

হো চি মিন

সমস্ত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে, তোমার প্রতিজ্ঞা,
সমস্ত মানুষের প্রতিভু, তোমার ইচ্ছা—
স্থির-জ্যোতি বিদ্যুতের আলোক ছড়িয়ে গেছে—
সমগ্র এশিয়ার স্বদেশ-মানসে।
মেকং নদীর জলে তোমার ছায়াটা আজ সরে গেছে,—
স্থির প্রাজ্ঞ দধীচি-অটল সেই দীর্ঘ মূর্তি ছায়া—
মিশে গেছে এশিয়ার,—পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে।
মেকং তো সাক্ষী আছে, ইতিহাস-বিপ্লবের
হাতে গড়া তোমার কীর্তির।
জানি আমি, মৃত্যু নেই—অমর তোমার নাম।
মৃত্যুই প্রাণের বীজ,—ছড়িয়ে পড়েছে সব
ভিয়েত্‌নাম নাম নিয়ে মুক্তিকামী মনের মিছিলে
জীবনের মুক্তির অপর উজ্জ্বল নাম তাই—হো-চি-মিন।
তোমাকেই মন্ত্র করে অনমনীয় গেরিলা বাহিনী
ছিন্নভিন্ন করে দেয়, নৃশংসতম মানুষের শত্রুদের।
কী সুন্দর! কী কমনীয় কান্তি পাই, শান্ত সমাহিতি,
তোমার প্রচণ্ডতম বিপ্লবের মুখে—
পরিপূর্ণ মহামানবের।
সংগ্রামের আগুন-রাঙা অক্ষর দিয়ে তাই,
মানবিক মমতায় কাব্য লিখে গেছ—পদ্মফুল গোলাপ আর
পাহাড়, ধানের ক্ষেত, অগাধ আকাশ নীল সমুদ্রের তীরে।
তোমার প্রাণের স্পর্শে
দুর্ভেদ্য দুর্গের মত অজেয় গর্বের মাথা তোলে ইন্দোচীন।
তোমার জীবন নিয়ে মৃত্যুহীন ইতিহাস, তুমি হো-চি-মিন॥